International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

দিব্যেন্দু পালিতের কথাসাহিত্যে নাগরিক জীবনে নারীর স্বাতন্ত্র্যতা

Md Nazmul Hassan

Research Scholar, Presidency University

Abstract:

লেখক দিব্যেন্দু পালিত (১৯৩৯-২০১৯) আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একজন কথাকার। তাঁর কথাসাহিত্যে নগর কলকাতার মানুষের জীবন কাহিনি উঠে এসেছে। নাগরিক জীবনে বহুতল আবাসনের ফ্ল্যাট নামক খাঁচায় নিউক্লিয়াস পরিবারের বসবাস। এরা বেশির ভাগই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত। এখানে ঘরের পুরুষ যেমন চাকরি করে তেমনি শিক্ষিতা নারীও কর্মমুখী। অনেকক্ষেত্রে স্বনির্ভর নারীদের বিবাহ হয়নি। নাগরিক জীবনে নারী স্বনির্ভর হওয়ায় সে সমাজের কাছে অধিকার দাবী করে। তার নিজস্ব ভাবনার জগত আছে, সে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে চায়। দাম্পত্য জীবনে মতের মিল না হওয়ায় অনেকক্ষেত্রে নারীর কপালে ডিভোর্স নামক কলঙ্কের ভার জুটে যায়। তবু নারী তার স্বনির্ভরতা ত্যাগ করে না, কর্মই তার জীবনে টিকে থাকার মূলমন্ত্র। 'মধ্যরাত', 'আমরা', 'একা', 'বিনিদ্র', 'ঢেউ', 'অনুভব', 'স্বপ্নের ভিতর', 'একদিন সারাদিন', ইত্যাদি উপন্যাসে নারীর স্বাতন্ত্র্যতার দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। সেইসঙ্গে 'বাড়ি', 'ফিরে আসা', 'ঘুম', 'সিঁড়ি', 'অন্তরা' 'যে গরিব', 'হয়তো, হয়তো নয়' ইত্যাদি গল্পে নাগরিক জীবনে নারীর স্বাতন্ত্র্যতার কথা তুলে ধরা হয়েছে।

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা ?
নত করি মাথা
পথ প্রান্তে কেন রব জাগি
ক্লান্ত ধৈর্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি
দৈবাগত দিনে।"[১]

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই প্রশ্ন চিরন্তন সত্য। আধুনিক যুগেও নারী সর্বত্র তার প্রাপ্য অধিকার পায়নি। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশ ভারতীয় সমাজে সর্বত্র এই নারী অধিকার সমান ভাবে স্বীকৃতি লাভ করেনি। গ্রাম-গঞ্জে আজও নারী পুরুষের বংশ বৃদ্ধির সহায়ক ও পতি সেবাই তার অন্যতম লক্ষ্য। বর্তমানে নাগরিক জীবনে নারী বহুক্ষেত্রেই স্বাধীকার অর্জনে সংগ্রামী। আধুনিক যুগে নারী তার অধিকার ভিক্ষা চায় না, বরং অধিকার দাবী করে।

লেখক দিব্যেন্দু পালিত (১৯৩৯—২০১৯) তাঁর কথাসাহিত্যের ক্যানভাসে নাগরিক জীবনে নারীর স্বাতন্ত্র্যতার দিকটি তুলে ধরেছেন। ১৯৫৮ সালে তাঁর কলকাতায় আসার পর থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতার নাগরিক জীবনের কথাই সাহিত্যে তুলে ধরেছেন। বিশিষ্ট সমালোচক সুমিতা চক্রবর্তী নগরায়ণকে চিহ্নিত করতে গিয়ে লিখেছেন,

"আধুনিক যুগের নগর-মনস্কতার দ্বিতীয় লক্ষণ সুনির্দিষ্ট ও অনাবরণ আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধে। প্রতিটি মানুষের চাহিদা মূল্যবান; প্রত্যেকের প্রাপ্য সমান হওয়া উচিত; প্রত্যেক মানুষকে তার আকাঙ্ক্ষা ও ক্ষমতা অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ দিতে হবে; প্রত্যেকের আছে নিজের জীবন নিজের মতো করে গড়ে নেবার অধিকার। নীতিগতভাবে এ-যুগের মানুষ মেনে নিয়েছে এ সবই।"[২]

লেখক দিব্যেন্দু পালিতের কথাসাহিত্যে এই বৈশিষ্ট্যেরই প্রতিফলন ঘটেছে। তাঁর কথাসাহিত্যের বেশিরভাগ পাত্র-পাত্রী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত। তাদের নিজস্ব একটা ভাবনার জগৎ আছে। এখানে আমার আলোচনার লক্ষ্য 'দিব্যেন্দু পালিতের কথাসাহিত্যে নাগরিক জীবনে নারীর স্বাতন্ত্র্যতা'। তাঁর 'মধ্যরাত' (১৯৬৭) উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ২৮-২৯ বছর বয়সি তপতী পেশায় একজন কলেজের অধ্যাপিকা। এই উপন্যাসে শহরের 'নষ্টনীড়' নামক মেয়েদের এক মেসবাড়িতে একদল অভিভাবকহীন শিক্ষিতা প্রাপ্তবয়স্কা নারী থাকে। এরা প্রত্যেকেই স্বাবলম্বী। মেসবাড়ির সাবিত্রীর পেশা নার্সিং, রিনা কুটির শিল্পের দোকানে চাকরি করে, বাসন্তী একটা বেসরকারি অফিসে কাজ করে। 'সম্পর্ক' (১৯৭২) উপন্যাসে শিক্ষিতা নীরা প্রধান বেতন ও পদোন্নতির লোভে দিল্লির হুইটনার বিজ্ঞাপন এজেন্সি ছেড়ে কলকাতার বিজ্ঞাপন এজেন্সি স্টারলেট হিউমে যোগ দেয়। 'আমরা' (১৯৭৩) উপন্যাসের নায়ক প্রিয়নাথ মজুমদারের

প্রেমিকা তনুশ্রী সরকার একটা সরকারি অফিসে চাকরি করে। 'বিনিদ্র' (১৯৭৫) উপন্যাসে একাধিক স্বাবলম্বী নারীর কথা আছে। নায়ক দীপ্ত রায়ের সম্পর্কে শম্পাদি কলেজে চাকরি করে। সুনীতা দীপ্ত'র হিন্দুস্থান ফস্টারে বিজ্ঞাপন এজেন্সির একজন কর্মী। পুষি দত্ত স্টুয়ার্ট অ্যান্ড গ্রিভ্স কোম্পানির মার্কেটিং ডিরেক্টর অশোক মুখার্জির সেক্রেটারি। 'একা' (১৯৭৭) উপন্যাসে আমরা দুইজন স্বনির্ভর নারীকে খুঁজে পাই। স্যান্ডহ্যাম কোম্পানির রিসিপশনিস্ট লিজ, যার মাসিক বেতন ছিল দেড় হাজার টাকা। আর একজন স্বনির্ভর নারী কোম্পানির কর্মচারী কণার কথা আমরা জানতে পারি। স্যান্ডহ্যাম কোম্পানিতে শিশির রায়ই তাকে চাকরি করে দেয়। সে কলকাতার এন্টালিতে থাকত। তবে তাদের এই স্বনির্ভরতার শর্ত ছিল শরীর সৌন্দর্য ও দৈহিক ব্যবহার।

'সোনালী জীবন' (১৯৮৬) উপন্যাসে আর্থারের পুত্রবধূ ও কন্যারা আর পাঁচজন নারীর মতো শুধুই গৃহিনী হয়ে থাকতে চায়নি, তারা স্বনির্ভর জীবন-যাপনে আগ্রহী। আর্থারের একমাত্র পুত্রবধূ তথা রবিন পাইবাসের স্ত্রী সারা ইতিমধ্যে টেলিফোন অপারেটরের কাজ শিখে নিয়েছে। তিন মাসের কোর্স শেষ হবার আগেই বড় ননদ রোজালিন নিজের অফিসে সারাকে একটা বদলি চাকরি জুটিয়ে দেয়। পরে মিস্টার সিং সারাকে ট্র্যাভেল এজেন্সির কাজ দেয়। বেতন আপতত দেড় হাজার টাকা, সঙ্গে লাঞ্চ অ্যালাউন্স হিসেবে আরও দুশো টাকা তাকে দেওয়া হবে। আলোচ্য উপন্যাসে আরও এক স্বনির্ভর নারী আর্থার পাইবাসের বড় কন্যা রোজালিনের কথা পাওয়া যায়। সে গ্রিনভ্যালি টি কোম্পানি লিমিটেডে বারো বছর টাইপরাইটারের কাজ করছে। লেখক সাংবাদিক জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে তাঁর 'ঢেউ' (১৯৮৭) উপন্যাসটি লিখেছিলেন। এখানে নগর কলকাতার মূলত দু'জন স্বনির্ভর নারীকে খুঁজে পাওয়া যায়। তাদের একজন সীতা চৌধুরী, অন্যজন মালবী। কনভেন্ট ও লরেটোয় পড়া মেয়ে সীতা চৌধুরীর বিয়ে হয়ে যায় রমেন চৌধুরীর সঙ্গে। তারা দুজনে একসঙ্গে গিলবার্ট মরিসন কোম্পানিতে কাজ করত। পরে সে পূর্ব পরিচিত অপরেশ গুপ্তর অ্যাকশন গ্রুপ অ্যাডভার্টাইজিং অ্যান্ড মার্কেটিং অ্যাসোসিয়েটস কোম্পানিতে যোগ দেয়। একাকিত্বের অবসাদ কাটাতে সে মাঝে মধ্যে সিগারেট খায়, নিজেই ফিয়াট গাড়ি ড্রাইভ করে। অপূর্বর প্রেমিকা মালবী দু'মাস হল কলেজের লিভ ভ্যাকানসিতে পড়াচ্ছে। 'স্বপ্নের ভিতর' (১৯৮৮) উপন্যাসে নগর কলকাতায় দক্ষিণী নামক এক রেসিডেনসিয়াল হোমে থাকে একদল স্বনির্ভর নারী। দক্ষিণী হোমে যারা থাকেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—বিশাখা, অর্পিতা, সুলেখা, সুবর্ণা, ছন্দা, কমলা, রমা, মমতাদি, শুক্লা, শঙ্করী, পমপম প্রমুখ। এরা প্রত্যেকেই স্বনির্ভর। বাবা-মা মারা যাওয়ার পর এম.এ পাশ বিশাখা বসু কলেজের অধ্যাপিকা হয়ে এই দক্ষিণীতে এসে থাকেন। কলেজের সহকর্মী বাসবীর মতো বত্রিশ বছর বয়সি বিশাখারও চোখে আছে স্বপ্ন। মাসে ত্রিশ টাকা বেশি দিয়ে সে দক্ষিণী হোমের দোতলায় থাকে। সাতাশ বছর বয়সি অর্পিতা স্টুয়ার্ট মর্গানের একজন দায়িত্বশীল সেক্রেটারি, অফিস আওয়ার্স শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার কাজের ছুটি নেই। বিধবা কমলা দাশ দক্ষিণী হোমের সুপারিনটেন্ডেন্ট। শোনা যায় শুক্লা বড় হোটেলে চাকরি পেয়েছে। দক্ষিণীতে যেমন নারী আসে তেমনি অনেকে দক্ষিণী ছেড়ে চলেও যাও। নগর কলকাতায় দক্ষিণী স্বনির্ভর নারীদের ভাড়া থাকার এক নিরাপদ আস্তানা। এই হোমে থাকা নারী চরিত্রগুলি অনেক বেশি অন্তর্মুখী। এরা বেশিরভাগ সময়ে একা থাকতে চেয়েছে, খুঁজেছে নিঃসঙ্গ সময়ে আড়াল। 'সিনেমায় যেমন হয়' (১৯৯০) উপন্যাসের নায়িকা ত্রিশ বছর বয়সি বিবাহিতা গার্গী ব্যানার্জি কলকাতার এক অফিসে অডিটের কাজ করে। তার স্বামী দীপঙ্কর ব্যানার্জি সিভিল এঞ্জিনিয়ারিং লাইনে কনসালটেন্সির কাজ করেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে চাকরি করায় তারা তাদের সাড়ে চার বছরের ছেলে দীপ্রকে দেখাশোনার জন্য মাসে দেড়শো টাকার বিনিময়ে কমলা'কে কাজ দেয়। গার্গী ছাড়াও উপন্যাস মধ্যে দীপ্রর বন্ধু শান্তনুর মা গীতশ্রী দে কয়েকজন অবাঙালিকে বাংলা ভাষা শিখিয়ে অর্থ উপার্জন করে। গার্গীর বাপের বাড়ির সুমিত্রা স্কুলে চাকরি করে। সমগ্র উপন্যাসটিতে গার্গীর চাকরি জীবনের টানাপোড়েন অধিক প্রতিফলিত হয়েছে।

'সংঘাত' (১৯৯২) উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ত্রিশ বছর বয়সের বিধবা ঋতুপর্ণা চৌধুরী। সে থাকে কলকাতা নগরের উপকণ্ঠে মধ্যমগ্রাম ধাপধাড়া গোবিন্দপুর বাপের বাড়িতে। ঋতুপর্ণার স্বনির্ভরতা প্রসঙ্গে উপন্যাস মধ্যে লেখক জানিয়েছেন,

"রোজগেরে মেয়ে। বিকেলে সন্ধেয় থিয়েটারের রিহার্সালে যায়, সকালে পার্ট-টাইম করে ব্যারাকপুরের স্কুলে।"[৩]

মধ্য কলকাতার স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবে রিহার্সালে আসার জন্যে সে দৈনিক চল্লিশ টাকা এবং যাতায়াতের জন্য আরো দশ টাকা, মোট পঞ্চাশ টাকা পেয়ে থাকে। তারপর ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে 'নূরজাহান' নাটকের নূরজাহান চরিত্রে অভিনয় করার পর পাবে দুশো টাকা ও মিষ্টির প্যাকেট। ব্যারাকপুরের স্কুলে সকালে পার্ট টাইম করার জন্য সেখান থেকে সে শ-সাতেক টাকা পায় প্রতি মাসে। 'অনুভব' (১৯৯৪) উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিবাহ বিচ্ছিন্না আত্রেয়ী ব্যানার্জি, যার বয়স বত্রিশ পেরিয়ে তেত্রিশে পড়েছে। উপন্যাসের শরীর জুড়ে আছে সমাজ জীবনে নারীর টিকে থাকার সংগ্রামী কথন। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে সে ফিলজফিতে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে এম.এ উত্তীর্ণ, এমনকি সে এম.ফিল করতে করতে ছেড়ে দেয়। সে ইতিপূর্বে জার্নালিজমে ফ্রি-লান্সিং করেছে, বাচ্চাদের পোশাকের ডিজাইন করার উপর তার আগ্রহ আছে। চাকরির জন্য সে চারটি অ্যাপ্লিকেশনও করেছিল। সে ক্যামাক স্ট্রিটে ক্রিয়েটিভ মার্কেটিং অ্যান্ড রিসার্চ সার্ভিসেস এজেন্সি (সংক্ষেপে সিমার্স্)-তে চাকরির অ্যাপ্লিকেশন পাঠায়। সিমার্স্-এর ম্যানেজার ডলি সেন আত্রেয়ীকে জানায়, তাদের প্রোজেক্টের নাম-প্রস্টিটিউট্স অফ ক্যালকাটা (কলকাতার বেশ্যা)। আত্রেয়ীর কাজ হবে কল গার্লদের কেসগুলো পড়ে-বিশ্লেষণ করে রিপোর্ট লেখা। এর জন্য সে ট্রেনিং পিরিয়ডে মাসে সব মিলিয়ে একত্রিশশো টাকা পাবে। সে মায়া দাস, শকুন্তলা, পামেলা, রাজমীর মতো কল গার্লদের

কেসগুলো ভালোভাবেই পড়েছিল। কিন্তু কলগার্ল স্বপ্নার কেস স্টাডি করতে গিয়ে সে থমকে যায়, সে বুঝতে পারে না কার বৃত্তান্ত পড়ছে? নগর কলকাতার ডলি সেন, আত্রেয়ী ব্যানার্জি, মায়া দাস, শকুন্তলা, পামেলা, রাজমী, স্বপ্না–এরা সবাই নিজ উপার্জনে আস্থাশীল থেকে স্বাতন্ত্র্য হয়ে উঠেছে। 'যখন বৃষ্টি' (১৯৯৯) উপন্যাসে দেবমাল্যর সঙ্গে সেপারেশন হবার পর নায়িকা শ্রেয়া বাড়তি উপার্জনের জন্যে সপ্তাহে তিনদিন বাড়িতে আটজন ছাত্রীকে গানের ট্যুইশন দেয়। 'একদিন সারাদিন' (২০০৩) উপন্যাসের ত্রিশ বছর বয়সি বিবাহ বিচ্ছিন্না নায়িকা শর্মিলা কাকার বন্ধু মিস্টার সরকারের অফিসে গিয়েছে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির অফিসে রিসেপশনিস্টের কাজের সন্ধানে। মিস্টার সরকার তাকে ফরেন ট্যুরিস্টদের গাইডের কাজের কথা বলেন। শর্মিলা কাজের মাধ্যমে একাকিত্ব কাটাতে চেয়েছে, চেয়েছে উপার্জন করতে। চলার পথে সে চেয়েছে আরও একটু নারী স্বাধীনতা ভোগ করতে।

লেখক দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে নারী আর্থিক ভাবে স্বাবলম্বী হওয়ায় নাগরিক জীবনের নিউক্লিয়াস পরিবারে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করতে উদ্যোগি হলে দাম্পত্য জীবনে মতনৈক্য দেখা দেয়। এরফলে অনেকক্ষেত্রে ডিভোর্সের মতো কলঙ্ক নারীর কপালে জুটে যায়। বর্তমানে নারীর অর্থনৈতিক অবস্থান স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত, এই আর্থিক স্বাবলম্বী বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানের ভিতকে গোড়া থেকে নাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। বোভায়া জানিয়েছেন,

"The economic evolution of womanos condition is in the process of upsetting the institution of marriage–it is becoming a union freely entered into by two autonomous indivisuals— the commitments of the two parties are personal and reciprocal— adultery is a breach of contract for both parties— either of them can obtain a divorce on the same grounds."[৪]

এবার দেখা যাক দিব্যেন্দু পালিতের বেশ কতকগুলি ছোটোগল্পে নারীর স্বাতন্ত্র্যতা। 'বাড়ি' (১৩৭০ ব.) গল্পের নায়িকা শিক্ষিতা মিনতি একটা স্কুলে পড়ায়। চারপাশে লোকজনের ভীড়ে সে তার ভালোবাসার মানুষ প্রকাশের হাত ধরে স্বচ্ছন্দে হাসতে পারে। কারণ সে নগর কলকাতার একজন সাহসী স্বনির্ভর শিক্ষিতা যুবতী নারী। 'ফিরে আসা' (১৩৭৭ ব.) গল্পের মণিকা অফিসে চাকরি করে। তার স্বামী অশোকও অফিসে চাকরি করে। মণিকার মাসিক বেতন চারশো টাকা। বাড়িতে তার একমাত্র বাচ্চা দেখভালের জন্য তারা কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। প্রয়োজনে কাজের মাসিকে তারা মাসিক ষাট টাকা বেতনও দেবে। বাড়িতে কাজের মাসি শরৎবালাকে পঞ্চান্ন-ষাট টাকা বেতন দেওয়ার পরেও অবশিষ্ট ৩৪০ টাকা কালের প্রেক্ষিতে একজন নারীর কাছে কম কিছু নয়। বাড়িতে শরৎবালার কাছে বিল্টুকে রেখে সারা সপ্তাহে অফিসের একঘেয়ে ক্লান্তি কাটাতে নাইট শোয়ে অশোক-মণিকার সিনেমা দেখার মধ্যে আছে স্বাচ্ছন্দ্য। 'ঘুম' (১৩৮০ ব.) গল্পের নায়িকা মণিকা একটি কলেজে পড়ায় এবং থাকে চাকুরে মেয়েদের হস্টেলে। সে অবাধে নগর কলকাতায় ঘুরে বেড়াতে পারে। নিজেকে নতুন রূপে দেখানোর জন্য মাঝে মধ্যে বাসা বদলও করে থাকে। সে অশোককে ভালোবাসে। আর তার এই ভালোবাসার প্রতি কারো তির্যক দৃষ্টিকে সে ভয় করে না। 'সিঁড়ি' (১৩৮৬ ব.) গল্পে নীলা চৌধুরী মার্কেটিং এজেন্সি কম্যুনিকেশন ইন্ডিয়া লিমিটেডে কপিরাইটারের কাজ করে। চৌরঙ্গিতে বহুতল আবাসনের ছ'তলার ফ্ল্যাটে তার অফিস। তার স্বামী অসীম চৌধুরীও অন্য একটি অফিসে চাকরি করে। দাম্পত্য জীবনে একদিকে স্বামী অসীমের মন রক্ষা করা ও অন্যদিকে কর্মজীবনে অফিস বস শ্যামলেন্দুর মন রক্ষা করা নীলার মতো নারীদের কাছে এক প্রকার বড় চ্যালেঞ্জ বলা যেতে পারে। সেই সঙ্গে নীলার জীবনে আছে সাত বছর বয়সের সন্তান টিনা। গল্পের পরতে পরতে আছে নীলার চাকরিতে পদোন্নতির আভাস। এই পদোন্নতির অন্যতম শর্ত শরীর সৌন্দর্য দিয়ে অফিস বস শ্যামলেন্দুর মন জয় করা। শ্যামলেন্দুই তার ওপরে ওঠার সিঁড়ি। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তী যথার্থই লিখেছেন,

"সতীত্বের স্বর্গ নয়, ইহলোকের স্বাচ্ছন্দ্যই তার কাম্য। পরিস্থিতি বিশেষে শরীরের ব্যবহারেও সে দ্বিধা করবে না। নারীর শরীর ব্যবহৃত হবার মধ্যে কোনও নতুনত্ব নেই। চিরন্তন ব্যাপার। কিন্তু এক্ষেত্রে সেই শরীর ব্যবহৃত হচ্ছে প্রেমের কারণে নয়, দেহবাসনায় নয়, বাধ্যতামূলক নিরুপায়তায় নয়। নারী তার শরীরকে হিসেব করে ব্যবহার করছে প্রোমোশনের শর্তরূপে। নীলা একটি চরম উদাহরণ।"[৫]

নাগরিক জীবনে কর্মক্ষেত্রে নীলার মতো নারীরা উচ্চাশার কাছে নৈতিকতাকে বিসর্জন দিতে পারে। নতুন ফ্ল্যাটে এসে চাকরিতে প্রোমোশন পেয়ে নীলা তার স্বামী অসীমের অনুমতি ছাড়াই রেফ্রিজারেটর কিংবা সোফা সেট কেনবার দায়িত্ব নিজেই নিয়েছে। নিজস্ব উপার্জনে ব্যক্তি স্বাধীনতা উপভোগ করাই নাগরিক জীবনে নারী মনের প্রবণতা থাকাটাই স্বাভাবিক। গল্পে অসীম-নীলার সম্পর্কের অবনতির মাঝে নীলার চাকরির একটা অতিরিক্ত গুরুত্ব আছে — "চাকরিটা আছে। চাকরিটাই বাঁচিয়ে দেবে তাকে।"[৬] সেই কারণে আজকাল সে চাকরিতে একটু বেশি সময় কাটায়। কলকাতার দশ বছর বয়সি এক কিশোরীর জবানীতে ব্যক্ত 'বাবা' (শারদীয়া পরিবর্তন, ১৩৯১ ব.) নামক গল্পটি। একটি কল-কারখানায় চার-পাঁচ মাস ধরে লক আউট চলায় কথকের বাবা কর্মহীন হয়ে পড়ে। সেখানে সংসার চালানোর দায়িত্ব এসে পড়ে অফিসে চাকরি করা মা'য়ের উপর। মা অফিসে ওভারটাইম কাজও করে। স্বামী যেখানে কর্মহীন সেখানে স্ত্রী চাকরির দৌলতে কন্যা ও পুত্রর শিক্ষা খরচ বহন করে। 'সোনার ঘড়ি' (১৩৯৪ ব.) গল্পে শ্যামলকে ছেড়ে সোমা দেবদত্তর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। একমাত্র সন্তান বছর দশ-এগারোর পুনপুনকে নিয়ে যার বেঁচে থাকার স্বপ্ন। সোমা একটা চাকরি চায়, চাকরি করার মতো যোগ্যতা তার আছে। তার চাকরি করার উদ্দেশ্য নারী স্বাধীনতা নয়। সে চাকরি চায় নিজে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য। কারণ তার সন্তানকে তাকেই মানুষ করতে হবে। 'অপরূপ

কথা' (১৪০০ ব.) গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সোহিনী একটি বড় অফিসে চাকরি করে। তার বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ বছর। সে চাকরিতে মাসান্তে প্রায় দু-হাজার টাকা পায়। তার উপর কোনো কিছু চাপিয়ে দিলেই সে তা মেনে নেয় না, তার নিজস্ব ভাবনার জগৎ আছে, কারণ সে স্বনির্ভর নারী। বিয়ে উপলক্ষে তার বাবা চাকরি থেকে রেজিগনেশনের কথা বললে সে শিরদাঁড়া সোজা রেখেই মা'কে জানিয়ে দেয়, "রেজিগনেশন দিতে হবে কেন ! ছুটি নেব। দরকারে উইদাউট পে ছুটি নেব।"[৭] তেমন দরকার হলে সে চাকরি থেকে এক-দুদিন ক্যাজুয়াল লিভ নেবে। 'অন্তরা' (১৪০০ ব.) গল্পের মুখ্য চরিত্র প্রায় আঠাশ বছর বয়সি বিবাহিতা অন্তরা যিনি অন্তর্দ্বন্দ্বে দোদুল্যমান। আগে থেকেই এম.এ পাশ যুবতী অন্তরার চাকরি করার বাসনা ছিল। ক্রিকেটার কৌশিক দত্তর সঙ্গে বিবাহ হলে সে ইচ্ছাটা চাপা পড়ে যায়। 'যে গরিব' (১৪০১) গল্পে শুধুই কেন পুরুষ সংসার চালাবে? এই প্রশ্ন থেকেই পার্বতী সংসারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয়। সে প্রথমে একটি বাড়িতে রাঁধুনির কাজ করত। স্বামী মেঘনাদের জুটমিলে লক আউট হলে সে আর পাঁচটি ফ্ল্যাটে রাঁধুনির কাজ করতে থাকে। সংসারে এক কন্যা, এক ছেলে, স্বামী ও নিজে মোট চারজনের ভরণ পোষণের দায়িত্ব এসে পড়ে তার কাঁধে। 'হয়তো, হয়তো নয়' (১৪০৩ ব.) গল্পে সংসারের হাল ধরার জন্য ত্রিশ বছরের যুবতী আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাসিন্দা ভাস্বতীর মতো মেয়েকে আমরা খুঁজে পাই। তার বাইশ-তেইশ বছর বয়সে একই সঙ্গে চাকরির অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এবং বিয়ের পাকা প্রস্তাব আসে। তার পিতা আদিনাথ এবং মাতা রেণুর অনুরোধে সে চাকরিটাই বেছে নিয়েছে। গল্পে উঠে এসেছে আদিনাথের পেনসনের টাকা বাদ দিলে সংসারটা ভাস্বতীর রোজগারেই চলে।

লেখক দিব্যেন্দু পালিত কলকাতার নাগরিক বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবনযাপনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর কথাসাহিত্যের সদর-অন্দরে সেই মধ্যবিত্তের চাকুরিক্ষেত্রে প্রবেশ, চাকুরিজীবন ও পারবারিক জীবনে চাকরির প্রতিক্রিয়ার সার্থক ও অনাবৃত চিত্রটি সহজ-সরল কথনশৈলীর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর কথাসাহিত্যে চাকরি শিক্ষিতা মধ্যবিত্ত নারীর বেঁচে থাকার অবলম্বন, আত্মপরিচয় এবং স্বাধিকার অর্জনের মূলমন্ত্র হয়ে উঠেছে। নারীকে স্বাধিকার অর্জনে ঘরে-বাইরে, কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার পথে, কর্মক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্র থেকে ফেরার পথে—সর্বত্র বিবিধ সংকট ও সংঘাতের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে চাকরি টিকিয়ে রাখতে ও পদোন্নতির প্রলোভনে অনেক নারী তার শরীরকে সচেতনভাবে ব্যবহার করেছে। লেখক দিব্যেন্দু পালিতের কথাসাহিত্যে নাগরিক জীবনে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি অফিসে নারীর হাতে কাজ নারীকে স্বাতন্ত্র্য করে তুলেছে।

তথ্যসূত্র

1. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (অষ্টম খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, মাঘ ১৪২১, পৃ. ৩৪
2. চক্রবর্তী, সুমিতা, ছোটগল্পের বিষয়-আশয়, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৬, পৃ. ৩৫৭
3. পালিত, দিব্যেন্দু, সংঘাত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ১৫
4. Beauvoir, Simone De, The Second Sex, First Vintage Books Edition, May 2011, P. 502
5. চক্রবর্তী, সুমিতা, ছোটগল্পের বিষয়-আশয়, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৬, পৃ. ৩৫৯
6. পালিত, দিব্যেন্দু, গল্পসমগ্র-২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ. ২৯
7. তদেব, পৃ. ৪২৫